Fifth Convocation held on December 7, 1969

নীহাররঞ্জন রায়*

আমার প্রায় চল্লিশ বৎসরের ছাত্রোত্তর জীবন কেটেছে বাংলা দেশের সদ্যযৌবন ছাত্রছাত্রীদের অন্তরঙ্গ সঙ্গ ও সান্নিধ্যে, তা'দের সুখদুঃখ, আশা নৈরাশ্য, অভাব অভিযোগ, স্বপ্নকল্পনা, আন্দোলন অভিযানের মধ্যে। তা'দের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন ছিল জড়িয়ে, প্রদীপের তেলের সঙ্গে সলতের মতন; তাদের নাড়ীর সঙ্গে ছিল নাড়ির যোগ। আশা ছিল, ইচ্ছে ছিল, কর্মজীবনের অবসান ঘটবে যেদিন, সেদিন পর্যন্ত এই যোগ অব্যাহত থাকবে। সে-আশা, সে-ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। পরিণত প্রৌঢ়ত্বে যখন পা বাড়ালুম তখন হঠাৎ একদিন দেখলুম, শুধু যে ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছল প্রাণবন্যার তট থেকে দূরে সরে গে'ছি তাই নয়, বাংলা দেশে থেকেই দূরে, বৃহৎ ভারতবর্ষের আর এক প্রান্তে ছিটকে পড়েছি। প্রায় পাঁচ বৎসর কাটলো এইভাবে; আর কিছু দিন পর কর্মজীবনের নাট্যমঞ্চে যবনিকা পড়বে। যৌবনসান্নিধ্য বঞ্চিত প্রাণ কোথায় যেন তা'র উৎস হারিয়ে ফেলেছে; কোথায় যেন বাংলা দেশের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দূর থেকে তাদের নানা কণ্ঠের নানা কাকলী কলরবের অস্ফুট, তালকাটা, মিশ্রিত ধ্বনি কানে ভেসে আসে; তার কিছু বুঝি, কিছু বুঝিনে। থেকে থেকে কেমন যেন মনে হয়, তাদের ভাষা বুঝি ভুলে গে'ছি; নিজেকে বড় দূরের মানুষ, বড় অসহায় মনে হয়। জীবনের অন্যক্ষেত্রে আমি কর্মরত, জ্ঞানান্বষণের অন্য চত্বরে। সেখানে সার্থকতা নেই, কর্মানন্দ নেই, এমন কথা বলিনে। তবু, স্বীকার করবো, ছাত্রছাত্রীদের যৌবনোন্মুখ জীবন থেকে যে প্রাণপ্রবাহ একদিন আমার প্রাণে সঞ্চারিত হ'তো আজ সে - প্রবাহ আমার জীবনকে আর সমৃদ্ধ করেনা। যে পরিমাণে আমি এই সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত সেই পরিমাণে আমি দরিদ্র, অবসন্ন।

'অবসাদের এই অপরাহ্নে' এই নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় উপাচার্য আমায় আহ্বান করলেন, আপনাদের এই সমাবর্তন সভায় অভিভাষণ দেবার জন্য। এ আহ্বান উপেক্ষা করবো, সে সাধ্য আমার ছিলনা। এক মুহূর্তে আমার চোখের সমুখে ভেসে উঠলো আমার আত্মার পরমাত্মীয় বাংলা দেশের অগণিত ছাত্রছাত্রীদের যৌবনদীপ্ত অথচ অস্থির, চঞ্চল, দিকহারা দৃষ্টির মুখগুলি। বহুদিন পর আবার তা'দের দেখবো, আবার তা'দের একটু স্পর্শ পাবো, স্বল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য হ'লেও তা'দের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার একটু সুযোগ পাবো, এত বড় লোভে প্রলুব্ধ হবো না, এমন ত্যাগী বৈরাগী আমি নই। তাছাড়া, এ আহ্বান বাংলা দেশের এক নবীনতম

* ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, যে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের গ্রাম বাজারে, শহরে বন্দরে, পথে প্রান্তরে, নদীর ঘাটে, পুকুরের পাড়ে, ঘরের দাওয়ায় আর ফসলের মাঠে আমার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনপ্রভাত কেটেছে। সে - জীবন এখনও নিশার ডাকের মত জীবনের পরপার থেকে যেন হঠাৎ হঠাৎ ডেকে উঠে। সে - ডাকে সাড়া দেবো না, এমন রিয়্যালিষ্ট আমি আজও হতে পারিনি'।

উপচার্য মশায়, আপনাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। আপনি আমায় অবসর দিলেন, বহুদিন পর আমার অন্তরের একান্ত প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের সান্নিধ্য আসবার, তাদের দেখবার; উত্তর বাংলার আকাশ বাতাসের একটু স্পর্শ পাবার। আপনাকে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগনকে আমার সকৃতজ্ঞ ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানাই। আর তোমার যারা ছাত্রছাত্রী, তোমাদের জানাই আমার গভীর ভালোবাসা, অন্তরের সুগভীর আশীর্বাদ। একদিন আমি ছিলাম তোমাদেরই একজন; তারপর চল্লিশ বৎসর কেটেছিল তোমাদেরই মধ্যে। জানি, সে সব দিন আর ফিরবে না, 'অস্তাচলে গেছে সে উর্বশী'। তবু, আজও জীবনের একান্ত কামনা, বোধ হয় আমার মত সব শিক্ষকেরই একই কামনা, তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের অদৃশ্য সংযোগ যেন কখনও বিচ্ছিন্ন না হয়, তোমাদের আজকের কালের ভাষা আমি যেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বুঝতে পারি, তোমাদের তরুণ কণ্ঠের গীতছন্দ যেন আমার প্রাণে শেষ পর্যন্ত অনুরণন জাগাতে পারে; আমার কাল থেকে যেন তোমাদের কালে আমি পারাপার করতে পারি। জানি, আমাদের কালে দেশকালবদ্ধ জীবনের অর্থ ছিল এক, তোমাদের কালে আর। আমাদের কালের অর্থ তোমাদের উপর আরোপ করবো, শিক্ষক হ'লেও এমন মূর্খ আমি নই। জীবনভোর চেষ্টা করেছি কালের সঙ্গে তাল বজায় রেখে পথ চলতে; আজও তাই তোমাদের ভাষা বুঝতে আমায় খুব বেগ পেতে হয় না, তবে প্রায় - বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খাইনে, শপথ করে এমন কথা বলতে পারিনে। তবু, দাবি করবো, এই বয়সেও অপটুতার জন্য। আবার, তোমাদের গভীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। তোমাদের সদিচ্ছা ও শুভবুদ্ধি, তোমদের কর্মোদ্যম ও নর্মসাধনা, তোমাদের স্বপ্ন ও কল্পনা সার্থক হোক, এই প্রার্থনা করি। ভাবী কালের রচয়িতা তোমরা; তোমরা জয়যুক্ত হও।

।। ২ ।।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন সমারোহ একটি প্রথাবদ্ধ উৎসব। সমস্ত প্রথারই, সমস্ত আচার সংস্কারেরই জন্ম বিশেষ দেশে বিশেষ কালে। কাল বদলায়; প্রথা, সংস্কার এক দেশ থেকে অন্য দেশে সঞ্চারিত হয়। সমস্ত অদল বদলের পরও যখন একই প্রথা ও সংস্কার বহুদিন চালু থাকে, তখন তা'র মৌলিক অর্থ হারিয়ে যাবে, তা'র ধার ক্ষয়ে যাবে, এ কিছু বিচিত্র নয়।

সমাবর্তন উৎসবও আজ তা'র মৌলিক অর্থ হারিয়েছে, তা'র ধার ক্ষয়ে গেছে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। যে - সব প্রথা ও সংস্কার এর সঙ্গে যে জড়িত, এর যা মন্ত্র, সব কিছুই এখন প্রায় অর্থহীন। যে সমাজব্যবস্থা, যে শ্রদ্ধা ও মানসিক পরিবেশ ছিল এর প্রাণমন্ডল, আজ তা' অন্তর্হিত। জীবনের, সমাজ বিবর্তনের আচার ও সংস্কার যা ছিল তা আমরা ভুলে গেছি বহুকাল; পন্ডিত সমাজের বাইরে তার খবরও আর কারো জানা নেই। আমাদের আধুনিক ও নবীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পাশ্চাত্য শিক্ষা - দীক্ষার সন্তান; তা'দের সমাবর্তনের প্রথা, আচার, সংস্কার সমস্তই মধ্যযুগীয় য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে থেকে ধার করা, মায় লক্ষণ - পোষাকটি পর্যন্ত। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষাক - লক্ষণটির কিছু অদল বদল ঘটানো হয়েছে, কিন্তু তাতে বহিরাবরণের সংস্কার হয়েছে মাত্র, অন্তরের বিশুদ্ধি ঘটেনি, হারাণো অর্থ ফিরে পাওয়া যায়নি। পাবার কথাও নয়, যেহেতু কাল গেছে বদলে। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম - রূপ বদলায়নি; কাজেই তাদের সমাবর্তন প্রথা, আচার ইত্যাদিরও নয়। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দু' - দু'টো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেলো, দু' - দু'টো বৃহৎ সমাজ বিপ্লব। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অঙ্ক, পদার্থ ও রসায়নবিদ্যা, এমন কি তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র পর্যন্ত সব কিছুরই দেহ - আত্মা গেছে বদলে, উপায় - পদ্ধতি তো বটেই। পৃথিবী জুড়ে মানব সমাজের পুনর্জন্ম হচ্ছে, নোতুন দেহে নবতর আত্মায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোথাও কোথাও সেই বিপুল তরঙ্গের কিছু কিছু ধ্বনি এসে হয়তো পৌঁছেছে, কিন্তু তা'র অভিঘাত এখনও ভালো করে লাগেনি দু' - দু'টো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন সত্বেও। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও তা'দের সমাবর্তন সমারোহে তাই নোতুন রূপ, নোতুন অর্থ কিছু ধরা পড়লো না, না ব্যবস্থা - বিন্যাসে, না পাঠক্রমে, না প্রথা ও সংস্কারে। সেই প্রথা ও সংস্কারে আমিও বাঁধা, এবং তা'রই একটি অঙ্গানুষ্ঠানের পুরোহিত হয়ে আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে।

বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এখানে যাঁরা সমবেত তাঁদের কাছে কিছু বলতে আমি আসিনি; হয়তো সে যোগ্যতাও আমার নেই। তাছাড়া, সমাবর্তন সমারোহ তার স্থান বা কালও নয়। যে দু' - চারটে কথা আমার বক্তব্য তা' ছাত্রছাত্রীদের কাছে, তোমাদের কাছে। প্রীতিপূর্ণ বিনয়ে তা' নিবেদন করছি। প্রথানুযায়ী রীতি হচ্ছে, সমাবর্তন উৎসবে যে তরুণ স্নাতকমন্ডলী ছাত্রজীবনের কর্তব্য শেষ করে বিচিত্র কর্মমুখর, সংগ্রামমুখর পৃথিবীর গার্হস্থ্য বা সংসার জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, অভিজ্ঞতার গৌরবে সমৃদ্ধ সমাজপ্রমুখ কোনো প্রধানের মুখ থেকে দু'-চারটি উপদেশ ও পরামর্শ তাদের শোনানো, ভবিষ্যত জীবনের পথে তাদের দু'-চারটি ইঙ্গিত দেওয়া, এমন ইঙ্গিত যা' তা'দের পথের পাথেয় হতে পারে। এ-কাজ যদি আমি করতে পারতুম, হয়তো খুশী হতুম, হয়তো হ'তাম না। উপদেশ শুনতে আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি, আজও লাগে না। দৃষ্টান্ত দেখতে ভালো লাগে। মানুষের স্বভাবই বোধ হয় তাই, এবং তোমরা নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম

নও। কাজেই উপদেশের কথা আমি বলবোই না। আর, পরামর্শ দেবার অধিকারই বা আমার কোথায়? হয়তো দীর্ঘ জীবনে অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি আমার কিছু ঘটেছে। পরিণত কৈশোর থেকেই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন, বাংলা সাহিত্যের, রবীন্দ্রনাথের কবিতার জগৎ আমাকে চঞ্চল করেছিল; তারপর ভারতবর্ষের ইতিহাস, শিল্প আর সংস্কৃতি, আর দেশ ও নানা পথে যাতায়াত করতে হয়েছে। কিন্তু সে - সমস্তই এক বিগত যুগের কথা। তোমাদের যে নোতুন যুগ তখন তার অরুণোদয়ের আভাসমাত্র দেখা দিয়েছে। কিঞ্চিদূর্দ্ধ বিশ বছর ধরে সে - যুগের বিকাশ ও বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করছি, কিন্তু তা করছি তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নয়। আমাদের দীর্ঘ যুগের অভিজ্ঞতা আমার যতই থাক, তোমাদের যুগের অভিজ্ঞতা আমার আছে, তার সমস্ত আশা, স্বপ্ন - কল্পনা আকাঙ্ক্ষা - অভিযোগ, দুঃখ - যন্ত্রনা, সংগ্রাম - কোলাহল আমি বুঝি ও জানি, এ কথা কিছুতেই বলতে পারিনে। কাজেই কোন অজুহাতে, কোথায় দাঁড়িয়ে কোন জোরে তোমাদের আমি পরামর্শ দেবো! সে - অধিকার আমি অর্জন করিনি।

তবু, এইমাত্র বললুম, তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হ'লেও তোমাদের যুগ আমি প্রত্যক্ষ করেছি, করছি আজও; গভীর সহানুভূতি নিয়ে, সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দৃষ্টি দিয়ে তোমাদের কালকে দেখতে ও জানতে চেষ্টা করেছি, তোমাদের সমস্যা, তোমাদের প্রশ্ন, তোমাদের বিক্ষোভের মূল কোথায়, তা'র আকৃতি - প্রকৃতি কি তা' বুঝতে চেষ্টা করেছি। তা'রই জোরে, সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমার জানা, দেখা ও বুঝার দু'-চারটি ইঙ্গিত তোমাদের সামনে রাখার চেষ্টা করবো। হয়তো ভুল হ'তে পারে; যদি তা' হয়, আশা করি, তোমরা আমার অপরাধ নেবে না।

।। ৩ ।।

আজকে তোমরা যা'রা স্নাতক হলে তা'রা সকলেই ভারবর্ষের স্বধীনত্তোর দ্বিধা-বিভক্ত বাংলাদেশের সন্তান। তোমাদের যখন হাঁটিহাঁটি পা' পা' বয়স তখনও আমরা সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার গর্বে ও আনন্দে, ভবিষ্যৎ সিদ্ধি ও সমৃদ্ধির স্বপ্নে মশগুল। কিন্তু স্বাধীনতা নিয়ে এলো নোতুন নোতুন দায় ও দায়িত্ব, প্রাক - স্বাধীনতার যত আশা ও আকাঙ্ক্ষা তা কর্মে রূপ দেবার দায়িত্ব। বৃহৎ এই দেশের অগণিত তা'র নরনারীর সে দায় ও দায়িত্ব পর্বতপ্রমান। যে - দেশের ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী সে - ইতিহাস যখন সমুখ দিকে এগিয়ে চলতে চাইলো তখন যুগ যুগ সঞ্চিত জড় - জঞ্জালের বোঝাও সেই পর্বতপ্রমাণ দায় ও দায়িত্বের উপর চেপে বসলো। দ্রুত এগিয়ে চলা সম্ভব হ'লো না, পায়ে পায়ে বাধা আমাদের গতিকে করলো ব্যাহত। আমরা তো বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা লাভ করিনি; সমাজকে উল্টে ফেলে একেবারে নোতুন সমাজ গড়বার পথে পা বাড়াইনি। আমরা ভেবেছিলাম, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আয়ত্ত হ'লে তা'রই

অধিকার নোতুন ভিতে ধীরে ধীরে নোতুন সমাজ গড়বো, পুরাণো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার ক'রে। অথচ অন্যদিকে মহাকালের রথ চলেছে তখন বিপুল বেগে, সূর্যরথের সপ্তাশ্ব ইতিমধ্যে রকেটের কাছে হার মেনে গেছে। কালের যাত্রায় আমরা তাই হেরে গেলুম; ধীরে ধীরে সমাজ ব্যবস্থা বিবর্তন, নোতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দূর থেকে দূরে চলে গেল দেখতে দেখতে। শুভবুদ্ধির আমাদের অভাব ছিল না, কর্মোদ্যমের ও বোধ হয় নয়। নোতুন নোতুন কর্মের পথে অমরা লিপ্ত হলুম, স্থির ধীর সংস্কারের পথে। সে পথে কিছু দূরও এগোইনি একথা সত্য নয়; নানাদিকে নানা সংস্কার হয়েছে, জীবনের প্রসার ও সমৃদ্ধিও ঘটেনি এমন নয়। যেমন, যেদিন আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম তখন ভারতবর্ষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় যতগুলি ছিল আজ তার সংখ্যা তিনগুণ প্রায়। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমনই গুণগত না হোক, পরিমাণগত প্রসার নিশ্চয়ই হয়েছে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। যত দোষ- ত্রুটিই থাক, আমাদের সংস্কার - ক্রিয়া একেবারে অসার্থক হয়েছে, একথা, আশা করি, কেউ বলবেন না।

কিন্তু কাল এক রকেট - রথে চড়ে দ্রুত চলেছে এগিয়ে। একদিকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং চিন্তা ও কর্মনায়কদের স্বপ্ন সুপ্ত সমাজকে শতাব্দীর ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে শুধু নয়, তা'র নিদ্রিত শক্তির উৎসমুখগুলিকে দিয়েছে খুলে, মূঢ় মূক মুখগুলিতে জুগিয়ে দিয়েছে ভাষা, তা'র আশা - আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন - কল্পনার পরিধি দিয়েছে বাড়িয়ে, টেনে এনেছে তাকে পৃথিবীর 'তরঙ্গ মন্দ্রিত জনসমুদ্র তীরে'। অথচ, যে ধীর পরিবর্তমান সমাজে আমাদের বাস, সে - সমাজ দ্রুতবর্ধমান আশা - আকাঙ্ক্ষার পরিধি স্পর্শও করতে পারছে না। মানুষের রোজগার বেড়েছে, কিন্তু বিশ্বহাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাড়নায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যের সঙ্গে তা'র রোজগার তাল রাখতে পারছে না। যত আমরা এগোই ততই যেন পিছিয়ে পড়ি; বর্তমান অবস্থাও অনিবার্য আকাঙ্ক্ষার দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। ফলে চারদিকে নানা অভাব, নানা অভিযোগ, নানা কলরব, নানা কোলাহল। তোমাদের অনেক দুঃখ - বিক্ষোভের মূলে এই দূরত্বের অস্পষ্ট অথচ সুতীক্ষ্ণ বোধ সক্রিয় বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা স্বাধীন হয়েছি স্ব-ইচ্ছায়; যে রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থা, যে শাসন-ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি তা'ও বহুলাংশে আমাদেরই ইচ্ছার প্রকাশ। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠান - প্রতিষ্ঠানের মত যে শাসনযন্ত্র আমরা গ্রহণ করেছি, তা' কিন্তু আমাদের ইচ্ছার প্রকাশ নয়, আমাদের নিজেদের গড়া তো নয়ই। তা' আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। অন্য ক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও আমরা ভেবেছিলাম, এখানে ওখানে একটু-আধটু সংস্কার ক'রে সেই পুরাণো যন্ত্র দিয়েই আমাদের রাষ্ট্রীয় ও শাসন - ব্যবস্থার ইমারৎ শক্ত করে গড়বো। মন বদলানো যতটা দরকার মন্ত্র পড়েই তা' করা যাবে, এই ছিল আমাদের ধারণা। এই ধারণা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। শাসনযন্ত্রের যা'রা চালক আর সে যন্ত্রে যা'রা ধারক ও বাহক অর্থাৎ জনসাধারণ, এ-

দু'য়ের ভেতর কোনো সংযোগ সূত্র তো নেইই, বরং বিদ্বেষ ও বিরোধ সৃষ্টির বীজ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও সে বীজ নেই একথা শপথ করে বলতে পারলে খুসী হ'তুম। তা'র ফলে শাসন - ব্যবস্থায় ও শাসনযন্ত্রের মধ্যে নানা শৈথিল্য, নানা অবজ্ঞা অবহেলাই শুধু নয়, তার আনাচে-কানাচে নানা দৃষ্টিকটু আবর্জনা, নানা দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়ার বিষবাষ্প। সে বাষ্প আকাশে বাতাসে ছড়াবে, সমাজের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে তোমাদের জীবনকেও স্পর্শ করবে, এ কিছু বিচিত্র নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কালো বাজারে দেশ গিয়েছিল ছেয়ে। তারপর দুর্ভিক্ষ, 'লোভীর নিষ্ঠুর লোভ', শিথিল রেশনিং ব্যবস্থা, ধার - করে - আনা কোটি কোটি টাকার লেন - দেন ও হস্তবিনিময় লীলা, মুদ্রাস্ফীতি আরও কত কি সেই কালোবাজারকে সমাজের কায়েমী ব্যবস্থার অঙ্গ করে নিয়েছে, এমন এক ব্যবস্থা যা'র হাত থেকে কারু নিষ্কৃতি নেই। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে আমরা সকলেই তাতে লিপ্ত। এ'র বিষ নানা পথ বেয়ে তোমাদের জীবনের মধ্যে বীজানুরূপে সঞ্চারিত হয়েছে, এবং তা'র জ্বালা কালোবাজারের রূপে নয়, কিন্তু অন্য নানা রূপে নানা দিকে বিষফোড়া হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। ধীরমন্থর সংস্কার প্রচেষ্টার সুযোগ নিয়ে, আইনোর শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে, শাসকবর্গের শুভ ইচ্ছা ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সমাজের কায়েমী স্বার্থ যত তা'রা সকলে তা'দের দৃঢ় শৃঙ্খল ও আর্থিক প্রভুত্বের পরিধি ধীরে ধীরে বিস্তৃত করে নিলো, তাদের শেকড় মাটির গভীরে চালিয়ে দিলো। আজ তা'রা এত দৃঢ় মূল, তা'দের প্রভাব এত বিস্তৃত যে সহজে তা'দের বিচ্যুত করা আর বুঝি সহজ নয়। 'বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ' তাই আজ বেড়েই চলেছে। সেই চিত্তক্ষোভের তপ্ত বাতাস কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল ভেদ করে তোমাদের গায়ে এসে লাগছে। তোমরা সব কিছু ভালো করে না জানতে না বুঝতে পারলেও উত্তপ্ত বোধ করবে, এতে বিস্মিত হ'বার কিছু নেই।

কিন্তু, কথা তো এখানেই শেষ নয়, বোধ হয় সুরু মাত্র। রাষ্ট্রের যাঁ'রা কর্ণধার, রাষ্ট্রীয় দলগুলির যাঁ'রা নায়ক এবং সেই হেতু জনমাসের যাঁ'রা বিধায়ক, স্বধীনতা লাভের পর ক্ষমতা ও প্রভুত্বের লাভ ও লোভের মোহ তাঁ'দের পেয়ে বসতে খুব দেরি হয়নি। সজ্ঞানে তাঁ'রা সে মোহের জালে জড়লেন, এমন কথা বলবো না, কিন্তু চারদিকে নানা ভাবে নানা কারণে — জাতের নামে, ধর্মের নামে, সংস্কার ও ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে, রাজনীতির ধরতাই বুলির আড়াল দিয়ে — নিজেদেরই রচা কর্মজালে এমন ভাবে তাঁ'রা আটকা পড়লেন, বেরিয়ে আসবার আর উপায় রইলো না। রাজনীতির কি দশা হলো তা'র ফলে, সে কথা বলবো না, কিন্তু সমাজের কি হলো তা' না বলা অন্যায় হবে। যে - কোন কালের যে - কোন সমাজ টিকে থাকে এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলে কিছু মৌলিক নীতিবোধ, কিছু মানবিক মূল্যবোধের ইমারৎ দেশে দেশে কালে কালে যতই বিভিন্ন হোক, তা'দের মূলে কিছু কিছু জিনিস থাকে যা' মেনে না চললে কোনো

সমাজ টিকেই থাকতে পারে না। আমাদের রাজনীতির কর্মজালে ঠিক সেই সব মৌলিক নীতিবোধ ও মানবিক মূল্যবোধগুলিই আহত হলো সকলের আগে। সেই সব যখন ডাঙ্গায় উঠানো হলো তা'দের শ্বাসরোধ হ'তে দেরি হ'লো না। আজ আমাদের রাজনীতিতে আর সমাজদেহে সেই সব নীতিবোধ ও মূল্যবোধের অল্পই বেঁচে আছে। ছাত্রসমাজতো বৃহত্তর সমাজের বাইরে কিছু নয়; কাজেই বৃহত্তর সমাজের নীতিবোধহীনতা, মূল্যবোধহীনতার নৈরাজ্য, শূন্যতার নৈরাশ্য তোমাদের জীবনেও নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করবে, এতেও আমি বিস্মিত বোধ করিনে।

।। ৪ ।।

কিন্তু এ-সমস্তই হয়তো বাহ্য, 'আগে কহ আর'।

বাইরে যা' ঘটছে তা' তোমাদের স্পর্শ করবে, তোমরা তা' দ্বারা প্রভাবিত হবে, এ তো কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় কথা, তোমাদের ভেতরটাও গেছে বদলে, এবং তা'ও খুব স্বাভাবিক কারণেই। আজকের দিনের ছেলেমেয়ে তোমরা; তোমাদের এই বয়সে তোমরা দেশ ও পৃথিবীর 'খবর' যতটা রাখো, তোমাদের বোধ ও বুদ্ধি যত প্রখর, তোমাদের দৃষ্টি যত সজাগ, আমাদের কালে একই বয়সে আমরা কিন্তু এত কিছু জানতুম না, বোধ - বুদ্ধি - দৃষ্টি আমাদের এত প্রখর, এত সজাগ ছিল না। তোমাদের পৃথিবীটা আমাদের পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়; দু'- দু'টো বিশ্বযুদ্ধের, দু' - দু'টো সমাজবিপ্লবের, বিজ্ঞান ও সমাজ - বিজ্ঞানের বিশ্ববিস্তারী আবিষ্কার - গবেষণার উত্তরাধিকার তোমরা পেয়েছ, আমরা যা' পাইনি। আমরা মানুষ হয়েছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র - রবীনন্দ্রনাথ, মোহিতলাল আর নজরুল আর শেলি - ব্রাউনিং, বড় জোর এলিয়ট পড়ে; তোমরা মানুষ হ'চ্ছ জীবনানন্দ - বিষ্ণু হদ, রিলকে - লোরচা পড়ে, সার্ত্র - কামু পড়ে, সেই আকাশের নীচে সেই বাতাসের মধ্যে যে আকাশে - বাতাসে মার্কস্ - লেনিন - মাওৎসে তুঙ্গ - ফ্রয়েড - ইয়ুং সার্ত্র সদাবিচরমান। আমাদের কালে আমরা যা'রা মার্কস্ - লেনিন পড়তুম বেশ বয়স হ'বার পর, তা'রা তা' করতুম চুরি করে, পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে। আমাদের কাছে আইনষ্টাইন ছিলেন শোনা নাম মাত্র; তোমাদের কাছে তাঁর আবিষ্কার প্রত্যক্ষ এটম - হাইড্রোজেন বোমায় রূপান্তরিত। কাজেই আমাদের আন্তর - জীবন আর তোমাদের আন্তর - জীবনের মধ্যে দুস্তর সমুদ্র। আমার মত যা'রা সে - সমুদ্র পাড়ি দিতে চেষ্টা করেন তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়; যাঁ'রা তোমাদের তটে এসে পৌঁছুতে পারেন তাঁদের পক্ষেও তোমাদের মনকে স্পর্শ করা খুব সহজ নয়।

জানি, আমাদের কালের চিত্তমনের সামনে যে- সব স্বপ্ন ছিল অর্থবহ, যে - সব আদর্শ, যে - সব নীতি ও মূল্যবোধ ছিল সক্রিয় ও সার্থক, সে - সব স্বপ্ন - আদর্শ - নীতি ও মূল্যবোধের অনেক ভিত্ গিয়েছে ধ্বসে। তোমাদের চোখে নোতুন স্বপ্ন, নোতুন আদর্শ, নোতুন নীতি ও

মূল্যবোধ। দ'য়ের মধ্যে কিছু সংগর্ষ অনিবার্য। এ - নিয়ে দুঃখ ক'রে, অভিযোগ করে লাভ নেই। ইতিহাসে এমন সংঘর্ষের নজীর কিছু কম নেই।

কিন্তু সংঘর্ষ যদি থাকেই, এবং আছে যে তা' আমরা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করছি, সে সংঘর্ষকে তো তা'র নিজের হাতেই ছেড়ে দিতে পারিনে, সংঘর্ষের স্বাভাবিক নিয়মের হাতে। যেহেতু আমি সামাজিক মানুষ,সেই হেতু এই সংঘর্ষের শক্তিকে আমি নিয়োগ করতে চাই নোতুন সমাজ - সৃষ্টির কাজে। সে - সমাজ আমার কালের বা যে - কোনো বিগত কালের সমাজ হবে, কোনো ভিন দেশি ভিন মানুষের সমাজ হবে এমন ইচ্ছা বা কল্পনা হতে পারে বাতুলের, শুভ ইচ্ছা ও শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নয়। সে - সমাজ হবে তোমাদের কালেরই সমাজ, এবং ভাবী কালের দাবী মেটাতে পারে, এমন সমাজ। এবং সে - সমাজ গড়বার দায়িত্বও সেই হেতু তোমাদেরই। আমাদের মধ্যে যা'রা বিগত কালের অথচ যাঁরা এ - কালের আশা - আকাঙ্ক্ষা যন্ত্রণা - বেদনার মর্ম কিছু বোঝেন, তা'র সঙ্গে সহানুভূতি যাঁদের আছে, তাঁ'রা তোমাদের সাহায্য কিছু করতে পারেন মাত্র, তাঁ'দের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। তা'র চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেন না। আর যারা 'মরম না জানে ধরম বাখানে, কাজ নেই সখি, তা'দের কথায়, বাহিরে রহুন তারা'।

আজকের এই নিত্যপরিবর্তমান পৃথিবীর পুরাণো নীতিবোধ, মূল্যবোধ, পুরাণো আদর্শ, স্বপ্ন - কল্পনার ভিত্ যদি ধ্বসে গিয়েই থাকে, এবং গিয়েছে যে, যাচ্ছে যে তা' নিয়ে আমার মনে সংশয় কিছুমাত্র নেই। তা'তে ব্যক্তিগত ভাবে আমার ও আমার মত অনেকেরই দুঃখ ভয় ভাবনার কোনো কারণও কিছু নেই। যা' পুরাণো, যা' ক্ষয়িষ্ণু বর জীর্ণ, যা' ক্ষীয়মাণ, যা' কালের দাবি মেটাতে পারে না, তা'র পরিণাম অনিবার্য বিনষ্টি। সে বিনষ্টি ঘটুক, তা' নিয়ে দুঃখ করবো না।

ইতিমধ্যে পিতামাতার সঙ্গে পুত্রকন্যার সংঘর্ষ ঘটবে, শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মপক্ষের, বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে বয়ঃকনিষ্ঠদের, এবং তা মত ও পথ নিয়ে, আদর্শ নিয়ে, মূল্যবোধ নিয়ে। তিক্ততার সৃষ্টিও হবে, সমাজে কিছু অস্থির অনিশ্চয়তার চাঞ্চল্যও দেখা দেবে, কিছু জিনিস পুড়বে, ভাঙ্গবে, এতো সবই স্বাভাবিক। এ - সব নিয়ে দুর্ভাবনা মাঝে মাঝে হয়তো হ'বে, কিন্তু হতাশ হ'বার কিছু কারণ দেখিনে। ইতিহাসে এ - জিনিস বারবার ঘটেছে। তা 'তে ইতিহাসের রথ অচল হয়ে যায়নি', মানব সমাজের অগ্রগতি তেমে যায়নি'।

দুশ্চিন্তা - দুর্ভাবনার কারণ অন্যত্র, এবং তা' কোথায়, কি ভাবে, যতটা সংক্ষিপ্ততায় সম্ভব, তা' বলেই আমার বক্তব্যে দাঁড়ি টানবো। আশা করি, তোমোদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না।

।। ৫ ।।

যেহেতু তোমরা সকলেই প্রথমার্ধোত্তীর্ণ বিংশ শতাব্দীর তরুণ - তরুণী, ধরে নিচ্ছি তোমরা হিন্দু নও, বৌদ্ধ নও, মুসলমান নও, খ্রীষ্টান নও, কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মের ধর্মীয় মানুষ নও; এবং তোমরা যে - সমাজ গড়তে চাও তা কোনো ধর্মীয় সমাজ নয়, কোনো জাতিগত ব্রাহ্মণ - কায়স্থ - বৈদ্য - জলচল - জলঅচল - পাহাড়ী - সমতলী সমাজও নয়। তোমরা গড়তে চাইছ সাধারণ মানুষের সাধারণ সমাজ যে - সমাজে ধনোৎপাদরেন উপায় - পদ্ধতি, উপার্জিত ধনের বন্টন - ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও বিন্যাস সাধারণ মানুষের করায়ত্ত। এক কথায়, তোমরা চাইছ, আমরাও অনেকে চাইছি, সাম্যবাদী সমাজ। কোনো সুস্থ,শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সাম্প্রতিক মানুষ এ - নিয়ে তোমাদের কাছে আপত্তি তুলবেন, আমি মনেও করতে পারিনে। জনসংঘকেও সাম্যবাদের দোহাই দিতে হয়, নইলে বাংলাদেশে নিরক্ষর চাষীর ভোটও পাওয়া যায় না!

কিন্তু আজকের দিনে তরুণ - তরুণী বলেই এ - কথাও তোমরা নিশ্চয় জানো যে, আজকের পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীদের সামনে, রাষ্ট্র ও সমাজ কর্মীদের সামনে সবচেয়ে বড় বিভ্রাট ও বিভ্রান্তি সাম্যবাদী আদর্শে যারা একান্ত বিশ্বাসী, সে - আদর্শে যারা প্রাণ বিসর্জনেও প্রস্তুত, তা'দের মধ্যেও। বরঞ্চ সেখানে এই বিভ্রান্তি গভীরতর। চীন - সোভিয়েট - রাশিয়া - যুগোশ্লাভিয়া - চেকোশ্লোভাকিয়া - রুমানিয়ার দৃষ্টান্তই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। তা'র ঢেউ তো আমাদের এই বাংলাদেশেও এসে পৌঁছেচে। আর ধনতন্ত্রবাদী, মিশ্রতন্ত্রবাদী দেশগুলির মধ্যে বিভ্রান্তির তো কথাই নেই।

এই সব আদর্শ ও উপায় - পদ্ধতিগত প্রশ্নের মীমাংশা একান্ত বুদ্ধিগত, একান্তই জ্ঞানসাপেক্ষ। সে - জ্ঞান ইতিহাসে, দর্শনে, অর্থনীতিতে সমাজ বিজ্ঞানে, পদার্থ বিজ্ঞানে, অঙ্কে - পরিসংখ্যানে নিহিত। সাম্যবাদ বনাম ধনতন্ত্রবাদের বিবাদের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু সাম্যবাদের মধ্যেও মত ও পথের বিভিন্নতা তো কিছু কম নয়, বিভ্রান্তিও নয়। আমার প্রথম দুর্ভাবনা এইখানে, দুশ্চিন্তার কারণ এরই ভেতর। কথাটা একটু খুলে বলি। ভালমন্দ'র কথা নয়, ইতিহাসের কথা এই যে, আমাদের কালে এত আদর্শ, এত মত ও পথের বিভেদ - বিভ্রান্তি ছিল না। আদর্শ ছিল একটি ঃ ইংরাজ রাজের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন। পথও ছিল বেশ সোজাসুজি। প্রথম পর্যায়ের আবেদন - নিবেদনের পালা যখন ব্যর্থ হোলো, তখন আমরা স্থির করলুম তর্জন গর্জনে, প্রয়োজন হ'লে বোমা মেরে ইংরাজ তাড়াবো। তারপর যখন গান্ধীজি এসে বললেন, ও - পথ ছাড়ো, আমার সঙ্গে এসো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে, অহিংস সংগ্রামের পথে, তখন আমরা সব ছুটে গেলুম সেই পথে। অটুট ইচ্ছার শক্তি, কর্মোদ্যম, ত্যাগের নেশা, কিছু সংগঠন শক্তি এবং প্রচুর হৃদয়াবেগই ছিল সে - পথে এগিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। আজকের দিনের রাজনীতি কিন্তু স্বদেশোদ্ধারের রাজনীতি নয়, নোতুন দেশে নোতুন সমাজ গড়বার

রাজনীতি। সে - রাজনীতিতে কর্মোদ্যম ও সংগঠন শক্তির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা'র চেয়েও বড় প্রয়োজন জ্ঞানের, এবং যে - বুদ্ধি জ্ঞানসাপেক্ষ সে বুদ্ধির। কোন আদর্শ তুমি গ্রহণ করবে, কোন মত, কোন পথ, কোন উপায় পদ্ধতি? কার কাছ থেকে, কোথায় তা শিখবে? মাঠে বক্তৃতা শুনে, রাস্তায় জনযাত্রার কোলাহলের মধ্যে, সস্তা খবরের কাগজের হেডলাইন পড়ে, না দিনের পর দিন গভীর অভিনিবেশে নিবিড় সাধনায় যে - সব শাস্ত্রে, যে সব পুঁথিতে নানা আদর্শের, নানা মত ও পথ, উপায় ও পদ্ধতির ইতিহাসগত। অর্থনীতিগত। সমাজ বিজ্ঞানগত আলোচনা ও বিশ্লেষণ আছে, তা' পড়ে? দাদারা যা বলতেন তা'ই বেদবাক্য, সেই দাদা - পলিটিকস্ ছিল আমাদের কালে; তোমাদের কালেও সেই দাদা - পলিটিকস্ চলবে, দাদাদের হাতের খেলায় পুতুল হবে তোমরা, আজকের দিনের রাজনীতি ও সমাজকর্ম সে - পর্যায়ের নয়। এখন রাষ্ট্র ও সমাজকর্ম করতে হ'লে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে উপায় নেই। জ্ঞান দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হয়, বাছতে শিখতে হয়, কলা - কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। যেমন আজকালকার যুদ্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের যুদ্ধ ছিল বহুলাংশে ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্যের; আজকের যুদ্ধ বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির, জ্ঞান - বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান - বিজ্ঞানের। আজকের দিনের রাষ্ট্রকর্ম সমাজকর্মও তাই।

তোমার আজকের দিনের সজাগ তরুণ - তরুণী; এই তো তোমাদের জীবনে সেই সময় যখন সেই বুদ্ধি সেই জ্ঞান তোমরা আয়ত্ত করবে নিরলস কর্মে ও সাধনায়। রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজকর্ম থেকে দূরে থেকে নয়; এমন কথা আমি কিছুতেই বলবো না কারণ আমার জীবনে আমি কখনও তা' করিনি; কিন্তু তাকে আশ্রয় মাত্র করে, তা'র মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে নিমজ্জিত করে নয়। তা'র আশ্রয়ে যতটুকু শেখা যায়, বুঝা যায়, চলমান জীবনকে জানা যায় ততটুকুই তোমাদের জীবনে তা'র মূল্য।

যদি একথা বল যে, আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিধি - ব্যবস্থা ও পাঠক্রমে এমন সুযোগ নেই যা'তে করে নোতুন সমাজ গড়বার জ্ঞান - বিদ্যা - বুদ্ধি আয়ত্ত করা যায়, নিজের পথ নিজে বেছে নেওয়া যায়, এবং তোমাদের বিক্ষোভের মূলে এ'টিও একটি বড় কারণ তা'লে এ নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে তর্ক করবো না। কারণ তোমাদের অভিযোগের মূলে অনিকখানি সত্য আছে, এ - কথা অস্বীকার করলে নিজের সঙ্গেই নিজে মিথ্যাচরণ করবো। শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠক্রম ইত্যাদি সমস্তই দেশ ও কালের সমাজব্যবস্থা, সমাজের অন্তর্নিহিত, উচ্চারিত ও অনচ্চারিত আশা - আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংপৃক্ত হওয়া উচিত, শিক্ষাবিদরা একথা স্বীকার করেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রমে কিন্তু এ - কথা যথেষ্ট স্বীকৃত নয়। আমাদের দেশের নোতুন সমাজ, সে - সমাজের ধন উৎপাদনের উপায় ও পদ্ধতি, সমাজ সংগঠনের রীতিনীতি - নিয়ম, সমাজমানসের নোতুন রূপ দেবার আশা - আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিফলিত নয়। আমাদের দেশ ও সমাজের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ঃ একটি ধীরমন্থরগতি সমাজের দেহেমনে দ্রুতগতি বিদ্যুৎশক্তির সঞ্চার, সে - সমাজের দ্রুত পরিবর্তন। আমাদের বর্তমান শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য তা'ই হওয়া উচিত ছিল, ছাত্রছাত্রীদের দেহমনজ্ঞানবুদ্ধিকে সেই

পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করা, নোতুনতর জীবনযুদ্ধের সৈনিক করে তা'দের গড়ে তোলা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রমে তা' যথেষ্ট প্রতিফলিত নয়, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আজও যে ইতিহাস - অর্থনীতি আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা পড়াই শেখাই, আমাদের যা পাঠক্রম, তা'তে নোতুন সমাজ সৃষ্টির ইংগিত খুব কমই; যে অঙ্ক ও বিজ্ঞান তা'দের শেখানো হয় তাতে ন্যুক্লিয়ার যুগের বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, আজকের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্মের শৈল্পিক কারখানার সৃষ্টিধর্মী কর্মী হওয়া যায় না, বড় জোত মজুর - কারিগর হওয়া যায়। যা' আমরা শেখাই তা'র সঙ্গে আজকে সমকালীন জীবনের সম্বন্ধ সত্যই বড় শিথিল, যেমন জীবিকার্জনে তেমনই সমাজ সংগঠনে। প্রায় সমস্ত বিষয়েরই পাঠক্রম এই ধরণের। যে - যুগ ইলেকট্রনকিস্ আর ন্যুক্লিয়ার ফিজিক্সের, ইকনমেট্রিক্সের, যে - যুগ মার্কস্ - ওয়েবার - ড্যুরখাইম - মাওৎসে তুঙ্গের, সে - যুগের অঙ্ক - পদার্থবিজ্ঞান - ইতিহাস - অর্থনীতি - ভূগোল - সমাজবিজ্ঞান যা' হওয়া উচিত তা' আমরা আজও ভালো করে প্রবর্তই করিনি। সেপ্রবর্তনের দাবি তোমরা নিশ্চয়ই করতে পারো, এবং তা অধ্যয়ন - অধ্যপনার ব্যবস্থা যাতে ভালো করে করা হয় তা'র চেষ্টা করা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবশ্য কর্তব্য, এ - বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আসল কথা, আর যাই আমরা - তোমরা করি না কেন, লেখাপড়াটা করে যেতেই হবে, এবং ভালো করে, নোতুন কালের সঙ্গে তাল রেখে। জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ যদি না ঘটে, এবং দ্রুত না ঘটে, তা'লে আমরা কালের সঙ্গে তাল রাখতে পারবো না; পারছিনে যে, তা'তো সূর্যালোকের মত স্পষ্ট। ইতিমধ্যে যা' হ'বে তা' হওয়া তো সুরু হয়েছে, বেশ কিছুকাল ধরেই। তোমাদের তারুণ্যের স্বপ্ন, আদর্শের প্রতি অনুরাগ, স্বচ্ছ হৃদয়াবেগ ও অপরিণত মন ও বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা তোমাদের ব্যবহার করছেন তা'দের পাশা খেলার গুটির মত; তোমরা তাঁ'দের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। তোমরা তরুণ - তরুণী ছাত্রছাত্রী যে - কোনো এলোমেলো ঝড়ের মধ্যে উলটো পালটা বাতাসের তাড়নায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে উৎক্ষিপ্ত হবে গাছের পাতার মত, এতো সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের কথা নয়। এ যে অস্বাস্থ্যকর। এই অবস্থার মধ্যে স্বপ্নকে সার্থক করা যায় না, আদর্শকে কর্মে রূপ দেওয়া যায় না, শক্তি অপব্যয়িত হয়, ব্যর্থ বিপর্যয়ে বিনষ্ট হয়। শক্তির এই অপচয়, এই ব্যর্থ বিপর্যয় আজ বাংলাদেশের সমাজকে পঙ্গু করে ফেলবার উপক্রম করেছে। বেশ কিছুকাল থেকে, স্বাধীনতার পর থেকেই, বাংলাদেশের উপর দিয়ে নানা বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সামাজিক সংহতি ও নোতুন সমাজ রচনার পথে নানা বাধা নানা বিপত্তি; তা'র উপর আবার শক্তির এই অপচয়, উদ্দেশ্যহীন উপায়পদ্ধতিহীন বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকমেল আর আত্মঘাতী আত্মকলহে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই অপচয় ও বিপর্যয় মারাত্মক, একাধিক কারণে। এই ধরণের অপচয় শুধু যে বর্তমানকেই বিনষ্ট করে তা' তো নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকেও হত্যা করে।

আর, অন্যদিকে ভারতবর্ষের অন্য একাধিক প্রান্ত এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, সর্বভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে ক্রমশ, শুধু প্রাথমিক শিক্ষায় নয়, যে উচ্চ শিক্ষায় ও

নানা আবিষ্কার - গবেষণার পথে দশ - বারো বছর আগেও আমরা ছিলুম সর্বাগ্রগণ্য, সেখানেও আমরা মার খাচ্ছি দিল্লীর কাছে, আলিগঢ় - ওসমানিয়ার কাছে, চন্ডীগঢ় - বোম্বাইর হাতে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষা - জ্ঞান - বিজ্ঞানের যে - প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে প্রয়োজনচেতনাই যেন ক্রমশ আমরা হারিয়ে ফেলছি।

অথচ, সৃষ্টিগর্ভ যে মনন - কল্পনা মানুষ ও তা'র সমাজকে নোতুন নোতুন আদর্শ ও ধ্যান - মননের দিগন্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তা'র যে কিছু অপচয় ঘটেছে বা অভাব হয়েছে, তা কিন্তু নয়। বাংলা কবিতায়, নাট্যমঞ্চে, ছবির পর্দায়, মননশীল প্রবন্ধ - নিবন্ধ রচনায় বাংলা সাহিত্য আজও ভারতবর্ষের সেরা, বোধ হয়, রাষ্ট্রীয় চিন্তায়ও। এর অর্থ তো নিশ্চয়ই এই যে, বাঙ্গালীর প্রাণমনের গভীরে কোথাও কোনো কোনো শক্তির উৎস আছে যা' আমাদের জীবনের মূলে রস যোগাচ্ছে এবং নোতুন নোতুন সৃষ্টিকর্মে, শিল্প ও সাহিত্যের নোতুন নোতুন পথে ামাদের প্রবৃত্ত করছে। কাজেই সৃষ্টির প্রতিভা আমাদের নেই, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিনে। যা' আজ নেই সে হ'চ্ছে বিচার ও বিশ্লেষণ বুদ্ধি; যা'র অভাবে আমরা ক্লিষ্ট ও বিপর্যস্ত হচ্ছি তা' হ'চ্চে সংহতি ও সংঘ শক্তি, সাংগঠনিক কর্মোদ্যম, জাগতিক চেতনা, এবং এ সমস্তই শিক্ষাদীক্ষা ও জকঞ্জান এবং চরিত্রসাপেক্ষ। কাজেই, শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে শৈথিল্যের কোনো অবকাশই নেই আমাদের সাম্প্রতিক কালের জীবনে।

তেমনই নেই চরিত্রের ক্ষেত্রেও। এ - চরিত্র নীতি - পাঠের, সদ্ভাব - শতকের চরিত্র নয়; তা'র কথা আমি মনেও আনছি না। আমি বলছি সেই নীতি ও মূল্যবোধের কথা যে মৌলিক নীতি ও মূল্যবোধ সমাজ গঠনোর মূলে, সমাজ সংহতি ও সংঘশক্তির মূলে, যে নীতি ও মূল্যবোধ মন ও মেতুদন্ডকে দৃঢ় করে, প্রাণে বল ও সাহস সঞ্চার করতে শেখায়, সাংগঠনিক শক্তি জোগায়, দেশে - দেশে দিকে - দিকে বিচিত্র কর্মে বিচিত্র কায়িক ও মানসিক শ্রমে মানুষকে প্রবৃত্ত করে। এই চরিত্র সৃষ্টি ছাড়া নোতুন দিনের নোতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে, অথবা কল্পনায় লঘু মেঘের উড়ে বেড়াবে। এই সুদৃঢ় চরিত্র গড়ার শ্রেষ্ঠ ঋতু যে - ঋতুতে জমি থাকে নরম। তোমাদের তরুণ জীবন সেই জমি যা' এখন আবাদ করলে তোমরা তা'তে সোনা ফলাতে পারো, শিথিলচরিত্র সমাজে নোতুন জীবন আনতে পারো। আমাদের কালে যা' আমারা পারিনি, তোমরা সেই নোতুন জীবনের ভগীরথকে ডেকে নিয়ে আসতে পারো। তোমরা তা'ই করো, এই প্রার্থনা করি।

বাঙ্গালীর সাম্প্রতিক জীবন বহুলাংশে একান্তভাবে রাজনীতিনির্ভর ও রাজনীতিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। জীব - বিজ্ঞান বলে, প্রাণীদেশের একটি মাত্র অঙ্গের বা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার যখন অনয সমস্ত অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যায়, ক্রমাগত একটি অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ই ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন কালক্রমে অন্য অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলো দুর্বল হ'তে হ'তে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জীব - বিবর্তনের ইতিহাসে এ - জিনিস বারবার ঘটেছে। সমাজ - বিবর্তনের

ইতিহাসেও তা' ঘটেনি', এমন নয়। গত পঁচিশ - ত্রিশ বছর ধরে দেখছি, বাঙ্গালী জীবন বড় বেশি রাজনীতি ও রাষ্ট্রকর্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে, যে - রাজনীতি ও রাষ্ট্রগতকর্ম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকে হয় একান্ত পৃথক করে দেখে, না হয় তা'দের দেখে রাজনীতি ও রাষ্ট্রকর্মের হাতিয়ার হিসেবে। আমার ধারণা, আমাদের একান্ত এই রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কমলকেন্দ্রকতা স্বাস্থ্যকর হয়নি, সুস্থ ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক সমাজ ও সংস্কৃতিকর্মের দায় - দায়িত্ব থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এবং তা'র ফলে আমাদের জীবন অত্যন্ত একপেশে হয়ে গেছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে আমাদের জীবন অত্যন্ত একপেশে হয়ে গেছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে, চরিত্রের ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বল ও পঙ্গু করেছে, যা'র ফলে আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও যথেষ্ট সুস্থ ও সবল থাকতে পারছে না। বাংলাদেশের ঊনিশ শতকের ও বিশ শতকের প্রথম পাদের নব জাগরণ কিন্তু এমনভাবে রাজনীতিকেন্দ্রিক ছিল না, একান্তভাবে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপমাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, পরবর্তী কংগ্রেসী আন্দোলন'ও নয়, সাম্যবাদী কম্যুনিষ্ট 'আন্দোলন' তো নয়ই। সর্ব ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে যে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ছিল তা'র একটি প্রধান কারণ জীবনের এই সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপের প্রতি বাঙ্গালীর সজাগ দৃষ্টি, যে - দৃষ্টি রাজনীতি, রাষ্ট্রকর্ম, ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত কিছুকে একত্রে বেঁধে তাদের সমন্বিত স্বাঙ্গীকৃত রূপ দান করতে চেষ্টা করেছিল। আমরা যেন কোথায়, কোন ফাঁকে জীবনের এই সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপটি হারিয়ে ফেলেছি, এবং এক একান্ত রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় কর্মসর্বস্ব জীবনে আত্মসমর্পণ করেছি। ইতিহাস বলে, এ ধরণের একপেশে জীবন ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় না, এবং মানবেতিহাসের যে - সব অধ্যায়ে যে - সব সমাজে এ - জাতীয় অবস্থা ঘটেছে সেই সমাজ পঙ্গু ও দুর্বল হয়ে পড়তে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি'। সে - দুর্দিন তোমরা বাংলাদেশে আর অগ্রসর হ'তে দিওনা, জীবনের সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপের কথা একটু স্মরণে রেখো, তোমাদের কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ, শেষ প্রার্থনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, হিন্দু - মুসোলমানের দাঙ্গামলহ, দেশের দ্বিখন্ডীকরণ, সুদীর্ঘ দুই যুগের রাজনৈতিক - সমাজিক - অর্থনৈতিক কর্মক্রমের বিচিত্র বিভ্রান্তি, আর্থিক অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্য, আদর্শভঙ্গের মনস্তাপ, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, আশাভঙ্গের আক্রোশ - একের পর এক, সব কিছু মিলে বাঙ্গালী ও বাংলাদেশেকে যেন এক দিকহারা পথচিহ্নলেশহীন গোলকধাঁধাঁর মধ্যে এনে ফেলেছে যা'র ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবার উপায় খুঁজে পাচ্ছিনে আমরা। আর সেই ধাঁধাঁর অন্ধকারে আমরা একে অন্যকে হুধু দোষারোপ করে যাচ্ছি, অন্ধ আক্রোশে নির্দয় আঘাত ক'রে চলেছি। আত্মঘাতরী এই আত্মকলহ। এরই মধ্যে কিছু আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন যাঁ'রা তাঁ'রা বাংলার মুষ্টিমেয় কবিকুল, সাহিত্যকার, বাংলার শিল্পীকুল এবং স্বল্পতর কিছু বুদ্ধিজীবি। কিন্তু সেখানেও উদ্দেশ্য ও আদর্শের বিভ্রান্তি, সমাজবিচ্যুতি ও বিশ্বাসহীনতার নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে।

আসল কথা, একথা নোতুন করে স্মরণ করবার প্রয়োজন হয়েছে যে, সমাজের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ভিত্ শিথিল হলে সমাজ বাঁচে না, সমাজ না বাঁচলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঁচে না। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে গাছকে বাঁচানো যায় না। সমাজের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ভিত্ শিথিল যে হয়েছে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। সে ভিত্‌কে শক্ত করে গড়তেই হবে, যদি আমরা বাঁচতে চাই, এবং তা করতে হবে গোড়া থেকে। যদি তা' করতে হয় তা'লে দু'টি উপাদান অপরিহার্য ঃ একটি চারিত্রিক দার্ঢ্য যার অর্থ দুর্দম ইচ্ছার শক্তি, কর্মোদ্যম, সংহতি ও সংগঠন শক্তি এবং মানুষের উপর অটুট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস; অপরটি শিক্ষা যে - শিক্ষার অর্থ দেশ ও কালগত সমাজের সমুখে যে - প্রশ্ন, যে - সমস্যা তার উত্তর সন্ধান। কথাটা খুব পুরাণো, এষ শ্বাশ্বতোয়ং পুরাণঃ কিন্তু পুরাণো কথাই বারবার নোতুন করে স্মরণ করতে হয়।

পরস্পর দোষারোপ করেলাভ নেই, লাভ নেই অন্ধ আক্রোশে, অত্মঘাতী আত্মকলহে।
'ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হ'তে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায় —
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি - অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙ্গিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব অভিমান,
শুধু এক মনে হও পার
এ প্রলয় - পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা জুলে।"

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ। তোমাদের পথ মঙ্গলময় হউক।

৭/১২/৬৯